বাংলাদেশের জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

১. জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী

১৯৮০'র দশকে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও ইদানিং বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর স্থানান্তর, পুনর্বাসন, পুনরাবাসন ও প্রত্যাবর্তনের বিষয়গুলো বৈশ্বিক উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে[১]। পৌনপৌনিক ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা, অতিবন্যা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে যারা নিজ বাস্তুভিটা ত্যাগ করে অভিবাসনে বাধ্য হচ্ছেন তাঁদেরকে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুত (Climate Forced/Induced Migrants) বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন পরিবেশ ও অধিকারভিত্তিক সংগঠনের গবেষণা ও প্রচারণায় এই জনগোষ্ঠীকে 'জলবায়ু শরণার্থী', 'জলবায়ু উদ্বাস্তু', 'পরিবেশগত উদ্বাস্তু' বা জলবায়ু পরিবর্তনের 'বাধ্যতামূলক অভিবাসী'ও বলা হচ্ছে[২]। কেউ কেউ ইংরেজি শব্দ দুটো যোগ করে climigrantsও বলছেন।

অভিধা বা পরিভাষার মতোই জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও এখনও কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নি। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (International Organisation for Migrations [IOM])-এর ব্যবহারিক সংজ্ঞা অনুসারে, জলবায়ু-তাড়িত বাস্তুচ্যুত বলতে তাদেরকে বোঝাবে যাঁরা "জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের আকস্মিক বা ধীর পরিবর্তন দ্বারা জীবন বা বসতির ব্যপকমাত্রায় ক্ষতির শিকার এবং সেজন্য রাষ্ট্রসীমার মধ্যে বা বাইরে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়"[৩]। অপরদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈশ্বিক সুশাসন কর্মসূচির (Global Governance Programme [GGP])-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব - সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার চরম ঘটনা এবং খরা ও পানিসঙ্কট - এর কমপক্ষে একটির তাৎক্ষণিক বা ধীর পরিবর্তনের কারণে বসতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে" তাদেরকে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুত বলা যাবে[৪]।

পরিভাষা ও সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি যে সারা পৃথিবীর শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় নতুন সঙ্কট সৃষ্টি করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তসরকারি প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]) ও স্যার নিকোলাস স্টার্ন-এর ভবিষ্যানুমান হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ ১৫-২০ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুতির শিকার হবে[৫]। ক্রিশ্চিয়ানএইড-এর তথ্যানুসারে শুধুমাত্র ২০০৭ সালে পৃথিবীব্যাপী ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ জলবায়ু-বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ২৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে[৬]। নরওয়ের শরণার্থী সংস্থা (Norwegian Refugee Council [NRC])-এর মতে ২০৫০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ১৭ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে[৭]। জাতিসঙ্ঘের আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতি মনিটরিং কেন্দ্র বলছে ২০০৯-১২ এই তিন বছরে পৃথিবীব্যাপী ১৪ কোটি ৩৯ লাখ মানুষ শুধুমাত্র দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

উপকূলীয় নিম্নভূমির দরিদ্র দেশগুলো থেকে এই বিপুল পরিমাণ জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের সংখ্যা রাজনৈতিক বিশ্লেষক, অর্থনীতিবিদ ও পরিবেশবিদদের ভাবিয়ে তুলেছে। এসব বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি ও স্থানান্তরনের ঘটনা স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ সঙ্কট বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। অনেকগুলো আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অবৈধ অভিবাসনের বিষয়টি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে[৮]। এ কারণেই বাংলাদেশ-ভারত-মায়ানমারসহ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করবে বলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক [এডিবি] ও বিশ্বব্যাংকসহ কয়েকটি আন্তসরকারি সংস্থা ইতিমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছে[৯]।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক বিষয় যেখানে শিল্পোন্নত উত্তরের রাষ্ট্রগুলো দায়ী এবং দক্ষিণের দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো তার শিকার। এ কারণেই, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুচ্যুতির শিকার জনগোষ্ঠীর মুক্ত স্থানান্তরের অধিকারের প্রশ্নটি যেমন সামনে চলে এসেছে তেমনি আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২. বাংলাদেশে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ক্যারোলিন সুলিভান, যুক্তরাজ্যের ম্যাপলক্রফট এবং জার্মানওয়াচ-এর জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে বাংলাদেশকে বর্তমান ও আগামী ৩০ বছরের জন্য সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিশেবে উল্লেখ করা হয়েছে[১০]। জাতিসঙ্ঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মকাঠামো সনদ (UNFCCC) অনুসারেও বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম।

বাংলাদেশের ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র উপকূল ও নদীভাঙন, ক্রমবর্ধমান ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, দীর্ঘমেয়াদি বন্যা, অতিরিক্ত লবণাক্ততা, খরা ও জলাবদ্ধতা। এসব কারণে সারাদেশে প্রতিবছর ৬ থেকে ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুতিতে বাধ্য হয়[১১]। নিম্নে বাংলাদেশের জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর তথ্য প্রদান করা হলো[১২]:

ঘটনা	জীবন-জীবিকার ক্ষতি (ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা)	বাস্তুচ্যুতি (বাস্তুচ্যুতদের সংখ্যা)	পৌনপৌনিকতা
উপকূলীয় সমুদ্র ও নদীভাঙন	৫০ হাজার থেকে ২ লাখ	৬০ হাজার	প্রতিবছর
লবণাক্ততা	১ লাখ ২০ হাজার	১০-১৫ হাজার	প্রতিবছর
জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়	৩ থেকে ৪ লাখ	১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার	প্রতি ৩ বছরে
জলাবদ্ধতা	৩ লাখ ৫০ হাজার	৩০ হাজার	প্রতিবছর

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনায় (BCCSAP) উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৭০ লাখ থেকে ২ কোটিতে পৌছাতে

পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে[১৩]। কোনো কোনো গবেষক এ সংখ্যা ৩ কোটিরও বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন।

সমুদ্রস্ফীতি, পৌনপৌনিক ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সবথেকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে নিয়মিত খরা ও বন্যাক্রান্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং হাওর। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে দেশের উপকূলের প্রায় ১৭ শতাংশ এলাকা নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন। প্রায় ৪ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত উপকূলীয় অঞ্চল প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভাঙন এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে জীবন-জীবিকা ও সম্পদহানির শিকার হয়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এডিবি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরো উপকূল জুড়ে সামুদ্রিক নিম্নচাপের কারণে বাংলাদেশের প্রচুর দরিদ্র ও প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর জনগোষ্ঠী আভ্যন্তরীণ অভিবাসীতে পরিণত হচ্ছে[১৪]। শুধুমাত্র জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বার্ষিক গড় ৪০ হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যায়[১৫]। ইতিমধ্যে এ ধরনের জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির ঘটনার কথা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার বাস্তুচ্যুতদের স্থানান্তর (movement), বসতি স্থাপন (resettlement), পুনর্বাসন (rehabilitation) ও প্রত্যাবর্তনের (reintegration) অধিকারের প্রশ্নটি উচ্চারিত হচ্ছে বারংবার। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশ কিংবা সাধারণ মানুষ দায়ী নয় বরং এর নির্মম শিকার। অতিরিক্ত গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোই পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য দায়ী। এ কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলোকেই চূড়ান্ত অর্থে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের দায় গ্রহণ করতে হবে।

ইতিমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের সম্পর্কে উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে[১৬]। মানবাধিকার ও পরিবেশ বিষয়ক অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থাও এ জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন অধিকারের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছে[১৭]। এ আলোকে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের সার্বজনীন প্রাকৃতিক ব্যক্তি (universal natural person) হিশেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসঙ্ঘের অধীনে একটি নতুন সনদ বা প্রোটোকল গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের জোরালো ও সুস্পষ্ট অবস্থান জরুরি।

ইতোমধ্যে কানকুন চুক্তির (২০১০) ১৪(এফ) অনুচ্ছেদে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতি, অভিবাসন ও স্থানান্তর নিয়ে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে আলোচনা, সমন্বয় ও সম্মিলিত উদ্যোগের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় দোহা সম্মেলনে ৭.এ/৪ অনুচ্ছেদে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের ক্ষয়ক্ষতির (Loss and Damage) আওতায় বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর নেতৃত্বে একটি আন্তসংস্থা কমিটিও গঠন করেছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নে অভিবাসীদের অপরিসীম ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকসহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের বাধ্যতামূলক অভিবাসনের আগেই আভ্যন্তরীণ স্বেচ্ছা-অভিবাসনকে উৎসাহিত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে[১৮]। কিন্তু সাড়ে ১৫ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তাসহ নতুন বসতি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দূরূহ কেননা এদেশের অধিকাংশ এলাকার জীবিকাই প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর এবং এসব দরিদ্র একক সাংস্কৃতিক (unicultural) সমাজে নতুন অভিবাসীদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়, ও জীবিকায়ন মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করবে।

ইতিবাচক উদাহরণ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো কয়েকটি দেশের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই 'জলবায়ু উদ্বাস্তু আইন' প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে এবং এ আইন দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে এসব দেশের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের উপর চাপ অব্যাহত আছে। অস্ট্রেলিয়ার খসড়া 'জলবায়ু উদ্বাস্তু আইন'টি উন্নত বিশ্বের জন্য উদাহরণ হতে পারে। এছাড়া মার্কিন কংগ্রেসে 'Refugee Act 1980' সংশোধন করে 'জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি' অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিল উপস্থাপন করা হয়েছে;

ভারত ও পাকিস্তানে উন্নয়ন প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য রয়েছে 'পুনর্বাসন আইন'। এছাড়া শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন ইতিমধ্যেই জাতিসঙ্ঘের 'আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক গাইডলাইন' অনুসারে নিজস্ব আইনি কাঠামো তৈরি করেছে।

কিন্তু মহাদেশীয় কিংবা আঞ্চলিক পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক উদ্যোগ দেখা যায় নি। সংযুক্তি-১ভূক্ত দেশসহ এ অঞ্চলের প্রভাবশালী দেশগুলোকে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের দায়িত্ব নেয়ার জন্য এখনই এসক্যাপ ও সার্ক পর্যায়ে চাপ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

৪. জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনে জাতীয় উদ্যোগ

সিভিল সমাজের দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী[১৯], অর্থমন্ত্রী[২০], খাদ্য ও দুর্যোগমন্ত্রী[২১], পররাষ্ট্রমন্ত্রী[২২] এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রী[২৩] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে কিংবা ইউএনএফসিসিসিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করা হয় নি।

অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে চরম খাদ্য ও জ্বালানি ঘাটতির দেশে পরিণত হয়েছে। বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তুদের নতুন বসতি নির্মাণ খাদ্য উৎপাদনের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। নতুন বসতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সঙ্ঘাতেরও জন্ম দিতে পারে যে সঙ্কট দেশ গত তিন দশক জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোকাবেলা করছে।

তাই, জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের উন্নত দেশে অভিবাসনের অধিকার আদায় বাংলাদেশের জন্য শুধু ন্যায্যতার প্রশ্নই নয়, দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য অত্যাবশকীয়ও বটে।

একই সঙ্গে জাতীয় ক্ষেত্রে প্রস্তুতিও জরুরি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটছে নিয়মিতই। জলবায়ুতাড়িতদের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের অধিকার প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাই আভ্যন্তরীণ পুনর্বসতি স্থাপনের সুযোগও তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রথমেই বর্তমানে অভিবাসিত বাস্তুচ্যুতদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন-জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি।

বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত না হলেও জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত অনেকগুলো সহায়ক উদ্যোগ ও আইনি কাঠামো বাংলাদেশে রয়েছে :

- দুই দশক ধরে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা-জাল কর্মসূচি (Social Safety Net Services) চালু রয়েছে। এ খাতে এখন জাতীয় বাজেটের প্রায় ১১ শতাংশ (বা ২৫ হাজার কোটি টাকা) অর্থ বরাদ্দ হয়;
- অনেক দুর্বলতা থাকলেও জাতীয় আশ্রয়ন কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ যা দেশের বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে নতুন উদ্দীপনা দিতে পারে;
- বাংলাদেশে একটি খাসজমি বিতরণ নীতিমালা আছে যা ভূমিহীন কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে কৃষিজমি বরাদ্দের গাইডলাইন হিশেবে কাজ করে;
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)তে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখার কথা বলা হয়েছে;
- সম্প্রতি পাশ হওয়া 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২'তে বাস্তুচ্যুতদের সংজ্ঞায়িত ও তাদের পুনর্বাসনকে দুর্যোগকালীন কাজের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;
- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় অদক্ষ শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং একটি ডিজিট্যাল তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে।

বিদ্যমান নীতিমালা, আইনি কাঠামো ও উদ্যোগগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে খুবই ছোট একটি উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় 'জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' প্রণয়ন করা সম্ভব। এ নীতিমালায় বিদ্যমান সুযোগগুলোয় জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট কর্মসূচি ও কার্যক্রম নির্ধারিত করা হবে। উল্লেখ করা দরকার যে, এমন অনেক কার্যক্রম রয়েছে (চলমান ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগের মতো) যাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের থেকে আগ্রহ ও প্রতিজ্ঞা অধিকতর জরুরি।

এ ধরনের নীতিমালায় বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বসতির নিরাপত্তা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকায়ন, অভিবাসন ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পুনর্বাসন, পুনর্বসতি ও প্রত্যাবর্তন (Rehabilitation, Resettlement and Reintegration [3R] Policy) বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি।

সবার আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবানুসারে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে ও ইউএনএফসিসিসিতে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া :

- বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন বসতিগুলোর প্রতিরক্ষা (উপকূলীয় বেড়িবাঁধ, পর্যাপ্ত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, জলবায়ু-সহিষ্ণু বাড়ি তৈরি ইত্যাদি) বাড়ানো;
- বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলোর মর্যাদাপূর্ণ জীবিকায়নের সুযোগ তৈরি (শিল্পায়ন, কৃষিতে প্রণোদনা দান, বিকল্প জীবিকায়ন ইত্যাদি);
- ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলোর স্বেচ্ছা-অভিবাসনের জন্য জীবিকা ও বসতির সুযোগ তৈরি (শহরভিত্তিক, শিল্পাঞ্চল, কৃষি অঞ্চল ইত্যাদি);
- সম্ভাব্য ও ইতিমধ্যে বাস্তুচ্যুতদের কারিগরি, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা গড়ে তোলা যাতে তারা উন্নত দেশগুলোর দক্ষ নাগরিক হিশেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে;
- সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুতদের বিষয়ে কার্যকর তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা (ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ, সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত খাত, গবেষক-নীতি নির্ধারক সম্পর্ক তৈরি ইত্যাদি);
- উন্নত দেশগুলোয় বাংলাদেশি নাগরিকদের (immigrant) অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক ইতিবাচক ভূমিকাগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গণে তুলে ধরা;
- বাস্তুচ্যুতদের গ্রহণ করতে পারে এমন রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার কৌশল ও করণীয় নির্ধারণ; এবং
- বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বসতি স্থাপন ও জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তার জন্য উন্নত দেশগুলো থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পর্যাপ্ত অর্থায়নের জন্য চাপ প্রয়োগ করা।

আমরা আশা করি ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির বিষয়টির অনধাবিত গুরুত্ব অনুসারে বর্তমান সরকারের সময়কালে আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী কয়েকটি ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে যা ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

১ N Myers (2005). 'Environmental Refugees: An Emergent Security Issue'. 13th Economic Forum. Prague: 23-27 May 2005

২ H Strange (2008). 'UN warns of growth in Climate Change Refugees'. The Times. New York: 17 June 2008

[৩] IOM (2008). Migration and Climate Change. IOM Migration Research Series. International Organisation for Migrations. Geneva: 2008

[৪] Glogov.org (2011). "Policy Forum on Climate Refugees". (Definition). Global Governance Project. Accessed on 25 October 2011

[৫] IPCC (2001). Climate Change 2001: Synthesis report. A Contribution of Working Groups I, II, and III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. Cambridge. Also see: N Stern (2006). The economics of climate change. Stern review. HM Treasury. London

[৬] Christian Aid (2007). Human tide: The real Migration Crisis. Christian Aid. London.

[৭] NRC (2008). Future Floods of Refugees. Norwegian Refugee Council. Oslo

[৮] J Barnett (2007). Climate Change and Security in Asia: Issues and Implications for Australia. Melbourne Asia policy Papers No.-9. University of Melbourne. Melbourne

[৯] C Raleigh, L Jordan and I Salehyan (2011). Climate Change, Migration and Conflict. The World Bank. 28 February 2011

[১০] SCU (2009*). Finding Solutions to Climate Change*. Southern Cross University (SCU). Lismore: December 2009. Also see: Maplecroft (2010). Big Economies of the Future - Bangladesh, India, Philippines, Vietnam and Pakistan - Most at Risk from Climate Change. Bath: October 2010 and S Harmeling (2010). Global Climate Risk Index 2010, Germanwatch. Bonn.

[১১] GM Sarwar (2005). Impacts of Sea Level Rise on the Coastal Zone of Bangladesh. Lund University. 21 November 2005

[১২] A U Ahmed and S Neelormi (2008). Climate Change, Loss of Livelihoods and Forced Displacements in Bangladesh. Campaign for Sustainable Rural Livelihoods (CSRL). Dhaka: December 2008

[১৩] MOEF (2009). Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009. Ministry of Environment and Forest. Government of the Peoples Republic of Bangladesh. Dhaka: September 2009

[১৪] A Barker (2008). Climate Change Migrants: A Case Study Analysis. Asian Development Bank. Manila: December 2008

[১৫] A. K. Gravgaard & W. Wheeler (2009). Bangladesh Fights for Survival against Climate Change, Washington Post, October 18, 2009 accessed on December 19, 2009.

[১৬] C. Mortreux and J. Barnett (2009). *Climate change, migration and adaptation in Funafuti, Tuvalu* in Global Environmental Change Journal-19. Elsevier Ltd: 2009. Also see: GCRP (2009). Global Climate Change Impacts in the United States. US Global Climate Research Program (GCRP). Washington DC; EC (2008). Climate Change and International Security: Paper from the High Representative and the European Commission to the European Council. Consilium and European Commission (EC). Brussels: 2008 and IOM (2010a).*Policy Dialogue on Environment, Climate Change and Migration in Bangladesh*. International Organisation for Migration. Dhaka: May 2010

[১৭] FOE (2007). A Citizen's Guide to Climate Refugees. Friends of the Earth (FOE). Australia: April 2007. Also see: EJF (2009). *No Place Like Home - Where next for climate refugees*?. Environmental Justice Foundation: London; H. Withanage (2008). *Climate Change and Environmental Governance*. Centre for Environmental Justice. Colombo: July 2008; C. Raleigh, L. Jordan and I. Salehyan (undated). Assessing the Impact of Climate Change on Migration and Conflict. The Social Development Department. World Bank Group: Washington DC and ADB (2009). Policy Options to Support Climate-Induced Migration. Asian Development Bank (ADB). Manila: December 2009

[১৮] J. Barnett and M. Webber (2009). Accommodating Migration to Promote Adaptation to Climate Change. Commission on Climate Change and Development. Stockholm. March 2009

[১৯] News Today (2010). PM For Int'l Body to Address Cross-Border Migration. Dhaka: 4 November 2010.

[২০] H. Grant, J. Randerson and J. Vidal (2009). UK should open borders to climate refugees, says Bangladeshi minister. The Guardian. London: 4 December 2009

[২১] AFP (undated). Climate Refugees Put Strain on Dhaka's Resources. Daily Motion

[২২] Give Your Vote (2009). Five Good Reasons Why Bangladeshis Should Have a Say in the UK Elections

[২৩] BBC (2000). West Warned on Climate Refugees. BBC News. 24 January 2000